দ্বিতীয় অধ্যায়
আত্মপরিচয় ও ছেলেবেলা

'নিজের কথা বলা মাত্রেই অহমিকা আছে। আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না, সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম'(১) আত্মপরিচয় প্রবন্ধাবলীর একেবারে গোড়াতেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষমা প্রার্থনা। আত্মজীবনী রচনার ফরমায়েশ রবীন্দ্রনাথের কাছে বার বার এসেছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে আত্মজীবনী লেখার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে এবং তাঁর সে ক্ষমতা নেই। আসলে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তার সুবিশাল সৃষ্টি বৈচিত্র্যে। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় কেবলমাত্র এরকম লেখাগুলিকেই তাঁর আত্মজীবনী করে দেখতে গেলে অনেকটাই বাদ পড়ে যাবে কবিকে পাবে না তার জীবন চরিতে। এক এক সময় মনে হয় সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে শুরু করে 'তোমার সৃষ্টির পথ' পর্যন্ত এই জীবনের কাহিনী টুকরো টুকরো কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোর মালা গাঁথলেই সন্ধান মিলবে সেই মহামানবের। কিংবা 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা' চতুরঙ্গ সেখানেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। তাহলে তাঁর আত্মজীবনী রূপে চিহ্নিত রচনাগুলির প্রয়োজন কি? আলোচ্য অধ্যায়ের সময়সীমা মনে রেখে কেবলমাত্র 'ছেলেবেলা'(১৯৪১) এবং 'আত্মপরিচয়' ৫ ও ৬ সংখ্যক প্রবন্ধ (১৯৪১) আমাদের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনী রচনার প্রসঙ্গে একাধিকবার নানাভাবে বলেছেন যে জীবনী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একাধিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মাত্র নয়। তাহলে? জীবনীর মূল হলো মানুষের তৈরি হয়ে ওঠার বাণী রূপ। 'নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই, . . . আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ এই সুন্দর প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়।'(২) এই উপলব্ধির সূত্রই হল জীবনীর মূলসুর। তাই দেখতে পাই ফ্রীস্কুল স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নারকেল পাতার ঝালরের মধ্যে দিয়ে দেখা সূর্যোদয় রবীন্দ্রনাথের জীবনীর একটা মুখ্য বিষয়। সূর্য রোজকার মতো একই ভাবে উঠেছিল কিন্তু ঐ বিশেষ দিনের উপলব্ধি কবির অনন্যপূর্ব , তাঁর হয়ে ওঠার সে এক পরম মুহূর্ত ।

আলোচ্য পর্বের (১৯৩০-৪০) মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ইতিপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের আত্মজৈবনিক রচনাগুলির একটা সাধারণ আলোচনা করব, ও তারই সূত্রে শেষ পর্বের বিশেষ আলোচনায় অগ্রসর হব। আমরা জানি ইতিপূর্বে ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। আর ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৪ সময় সীমায় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠির সংকলন। এই ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের জমিদারী পরিদর্শনের সূত্রে পূর্ববঙ্গবাসের দলিল তাই একেও জীবনী আলোচনার সূত্রে একান্ত উল্লেখ্য বলে ধরতে হবে।১৮৯৪ সালের ৭ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লিখেছেন—

'আমিও জানি, তোকে যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। ··· সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে; সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে— কেবল গল্পগুজবে আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাসা নয়। বায়রন্ মুর্‌কে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে। ··· যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে।

বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে। তবে সে মর্মর ফুটে।'(৩)

অন্য চিঠিটি আরও কিছু পরে, ১১ই মার্চ ১৮৯৫-এ লেখা।

' আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। ··· ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমনি বহুমূল্য নয়; কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, সেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন— যা হয়তো আমি ছাড়া ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধহয় আর কেউ বুঝবে না।' (৪) সঙ্গে আর একটি চিঠি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কে ১৯০২ সালের মার্চ মাসে লেখা—

'আমার পুরাতন চিঠিপত্রের একজায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নান সিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। ··· কিন্তু এতো অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়। এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেননা এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। ··· আমি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জলে সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক-এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি।'(৫)

ছিন্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্বভাব ব্যক্ত হয়েছে তার বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি তিনটিতে করেছেন। প্রথমত : তাঁর নিজের স্বভাব যে রকম অকৃত্রিম সহজ ভাবে এই চিঠিগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য রচনায় হয় নি। দ্বিতীয়ত : চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ প্রবাসের রোজনামচা নয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে অতিক্রম করে বাইরের জগৎ থেকে সংগ্রহ করে আনা দুর্লভ সৌন্দর্য সামগ্রী যা তাঁর স্বভাবকে সুন্দর করে অসামান্যতা দান করেছে একেই তিনি চিঠির বিষয় করেছেন।

তৃতীয়ত: মানুষের হয়ে ওঠার যে ইতিহাস তাকেই যদি জীবনী বলি তাহলে পূর্ববঙ্গ বাসের ঐ দশটা বছরের সামগ্রিক

অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ আছে জমিদার রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখা ঐ পত্রগুলিতে।

চতুর্থত : যে কোনো কথাই মনের মানুষ ছাড়া মনের কথা হয়ে ওঠে না। তাই স্বভাব কবি রবীন্দ্রনাথেরও মনের মতো পত্র-বন্ধুর সান্নিধ্যে স্বভাবটুকু মনের মতো করে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পাঠক ব্যাতিরেকে লেখকের সার্থকতা শূণ্য না হলেও সামান্যই।

একই ভাবে জীবনস্মৃতি রচনার ভূমিকায় বলেছেন 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে · · ·। এই সব স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু, বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই, মানুষের কাছে তাহার আদর আছে।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে।'(৬)

জীবনস্মৃতি রচনার ইতিহাস আলোচনা করলে জানিতে পারি স্বেচ্ছায় জীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথ হাত দেন নি। বস্তুত জীবনী লেখায় তাঁর সাধ ছিল না কোনোদিনই। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য বলেছেন তাঁর সাধ্যে কুলোয় না। জীবনস্মৃতির প্রধান অনুরোধকর্তা ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রকাশ করলেন নিজের দাবি— 'আপনার জীবনটা চাই' তাই অনিচ্ছা ও আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মেনে নিলেন দাবি 'তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল।'

কিন্তু প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি প্রকাশ শুরু করার পরেই সমালোচনার শিকার হন রবীন্দ্রনাথ। আর তখনই ঠিক করে নেন নিজের জীবন ছোটো করার । সম্ভবত তখনই তিনি স্থির সংকল্প নেন, ঘরের সঙ্গে পরের, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যাবতীয় সংঘাত-সংঘর্ষের বিবরণকে এড়িয়ে, জয়-পরাজয়ের যুদ্ধকে নেপথ্যে সরিয়ে, আপন জীবন বৃত্তান্তকে পৌঁছে দেবেন অকাল উপসংসারে বিতর্ক-বিবর্জিত আকস্মিক সমাপ্তিতে।

কড়ি ও কোমল রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছরের রচনাকালের ফসল। কিন্তু জীবনস্মৃতি গ্রন্থের কড়ি ও কোমল পর্যায়টিতে রবীন্দ্রনাথ সামান্য কটি লাইনে কাব্যগ্রন্থটির ও কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বাকী সবটাই তাঁর এই পঁচিশ বছরের অনুভূতিগুলির সঙ্গে পৃথিবীর সবকিছুর একটা মিথ্যে বানিয়ে তোলা দূরত্ব ও তার থেকে পালিয়ে আসার, এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস।' এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।'(৭) আবার সেই সাধ্যে না কুলোবার অজুহাত দেখালেন তিনি।

কিন্তু এরপরে মৃত্যুর প্রায় দোরগোড়ায় এসে রবীন্দ্রনাথ আরও একবার এই প্রথম পঁচিশ বছরের ছবি আঁকার প্রচেষ্টা করেছেন । নাম দিয়েছেন 'ছেলেবেলা'। ১৯১২-১৯৪০ আরও আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন এই জীবনীতে তাই আঙ্গিকের ও ভাষার পরিবর্তনটা নজরে পড়ে খুব সহজেই । কিন্তু পঞ্চাশ

বছরের সেই সংকোচটা অনায়াসে অতিক্রম করে গেছেন ঊনআশি বছরের লেখায়। তার সব থেকে বড় প্রমাণ 'ছেলেবেলা'র কোথাও কোনো পরিচ্ছেদের নামকরণ করে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। শৈশব কৈশোরের চলার পথে বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভেসে আসা স্রোতে বিষয়গুলি অবিশ্রান্ত ভাবে তীরে এসে আঘাত করে কলধ্বনি তুলে আবার সহজেই মিলিয়ে গেছে। আর এই আঘাতের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে বালকের হৃদয় তারই স্মৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে পরিণত রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধাবলীর প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'বছর পরে। আসলে আত্মজৈবনিক বিভিন্ন প্রবন্ধ একত্রিত করে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর প্রথম তিনটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ১৯০৪, ১৯১১ এবং ১৯১৭ সালে লেখা। প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিতও হয়েছিল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধ তিনটি অনেক পরে তাঁর সত্তর ও আশি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ। আত্মজীবনী রচনার পেছনে যে অহমিকা কাজ করে বলে প্রবন্ধকারের বক্তব্য, সেই অহংকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম প্রবন্ধ তিনটিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষটা আর বিংশ শতাব্দীর শুরুটায় রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষত কাব্যসাহিত্য একটি নতুন তত্ত্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল— জীবনদেবতার তত্ত্ব। মানসী, চিত্রা, সোনারতরী কাব্যগ্রন্থ গুলিতে এই জীবন দেবতার একাধিক উল্লেখ পেয়েছি। 'এই যে কবি, যিনি আমার ভালোমন্দ , আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।'(৮) এই জীবনদেবতা কবির মতে কেবল ইহজীবনের খন্ডতাকেই ঐক্যদান করেছে তাই নয়, অনাদিকালের উৎস হতে তাঁর যে পথ চলা সেই প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি জীবনদেবতাকে অবলম্বন করে কবির মধ্যে অগোচরে উপস্থিত রয়েছে। তাই প্রকৃতির প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে এমন একাত্ম অনুভব করেন কবি।

প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— 'আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইতে চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কিনা জানি না— কারণ বোঝানো কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই— যিনি বুঝিবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যে ও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ।'(৯) যদিও রচনার একেবারে গোড়াতে তিনি বলে দিয়েছিলেন যে নিজের জীবন বৃত্তান্তটা তিনি বাদ দিয়ে কেবল কাব্যে তাঁর জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটুকু লেখবার সংকল্প নিয়েছেন তবুও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আর যাই হোক এ প্রবন্ধে কবির আত্মপরিচয় কোথাও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। এবং সেকথা রবীন্দ্রনাথও বেশ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন। আসলে নিজের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন রবীন্দ্রনাথের কোনোসময়ই অভিপ্রেত ছিল না। তিনি পাঠকের কাছে কবি হয়ে প্রকাশিত হতে চেয়েছিলেন তাই কাব্যের মধ্যে দিয়ে যে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন সেটাই তাঁর মনের কথা সেটাই সমাজবন্ধনহীন মুক্ত রবীন্দ্রনাথ । তাকেই পাঠক চিনুক জানুক ও যদি আপন করে নিতে পারে তো নিক নাহলে কাব্য ও তার কবি দুজনেই মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমরা জানি কবি রবীন্দ্রনাথ যত বেশি বিশ্বের পরিচিতি পেয়েছেন ততই ধীরে ধীরে কর্মী হয়ে উঠেছেন

তখন তাঁর আত্মপরিচয় প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে। তাই 'আত্মপরিচয়' এর শেষ প্রবন্ধ তিনটি একটু ভিন্ন ভাবে লেখা। আসলে রবীন্দ্রজীবনী জানার ছলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে জড়িয়ে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়কে ঘিরে নানান রটনা ও অলীক কাহিনী প্রচারের যে প্রয়াস সে সময়ে কলকাতার উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচলিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার থেকে দূরে থাকতেই এই পথ অবলম্বন করেছিলেন। যেটুকু ঘটনা তিনি নিজের জীবনের শুনিয়েছিলেন তার সবটাই বাল্য ও কৈশোরের সুতরাং তাতে উল্লিখিত সমাজকে ইন্ধন যোগানোর মশলা মিলবে না।

নিজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এই যে প্রয়াস কবির জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। 'বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না।'(১০) আবার ঊনআশি বছরের জন্মদিনে লিখলেন —' নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করি নে, কিন্তু আমি তাকে বার বার অনুভব করেছি। বিশেষভাবে আজ যখন আমার আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি তখন তার উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'(১১)

আমরা জানি যে জীবনস্মৃতির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোনো এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' তাই জীবনের শেষপর্যন্ত একাধিকবার ঘুরে ফিরে তিনি আপন অন্তরের সঙ্গে বাইরেটাকে মেলাবার অক্লান্ত প্রয়াস করেছেন। আবার কখনও নিজের সৃষ্টির মধ্যেই পেয়েছেন নিজের পরিচয়। কিন্তু একথাও আমরা জানি যে তাঁর কর্মী রূপ ও স্রষ্টা রূপের মধ্যে কোথাও কোনো বিরোধ নেই। শান্তিনিকেতন তাঁর সৃষ্টি আবার শান্তিনিকেতনেই তাঁর কর্মভূমি। এই শান্তিনিকেতনের আদর্শ তাঁর ইতিহাসের পাতা থেকে আহৃত তপোবনের আদর্শ না, এ তাঁর আত্মার উপলব্ধি থেকে সঞ্চিত। তাই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার একেবারে গোড়াতে উপকরণ বিরলতাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের আইন কানুন সিলেবাসের জঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন আর শিক্ষার্থীদেরও। 'লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমরা সার্থকতা।' (১২) সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয়।

আত্মপরিচয়ের প্রবন্ধগুলিতে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটেছে সে হল কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি এখানে আরও একবার নতুন করে উপলব্ধি করেছেন— 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবিমাত্র।'(১৩) সেই কবি যার শৈশব কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস কিংবা কোনো সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধের অন্ধকার ছায়ায় আবৃত নয়। বরং বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিমুহূর্তের উদার আনন্দের পরম উপলব্ধিতে, বিশ্বমানবের জন্য ভালোলাগার সহস্র উপকরণের মাঝখানে তার মুক্তি। এই সব উপলব্ধিগুলি মানুষের খাতিরে সৃষ্ট এমন নয়। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের উদ্দেশে এদের সৃষ্টি। তাই খুব ভোরে শীতের মধ্যেও ছোট্ট বালকটি আরামের শয্যা ছেড়ে ছুটে যেত ঐশ্বর্যহীন বাগানটাতে ' প্রাচীর ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে একসার নারকেল পাতার ঝালর তখন অরুণ আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে।'(১৪) বালকের এই অহেতুক কৌতূহল একদিন কোন

উদয়পথ দিয়ে এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে হঠাৎই আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। তার সেই দেখার মূল্য সোনা রূপোর ওজনে মিলবে না সত্য। কিন্তু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে গেলেন তিনি সেখানেই তার সার্থকতা।

শৈশবে যখন প্রথমবার জোড়াসাঁকোর চৌহদ্দির থেকে বেরিয়ে বাইরে গেলেন 'জীবনস্মৃতি'র সে একটা পৃথক পরিচ্ছেদ 'বাহিরে যাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকোঠায় উজ্জ্বল বর্ণে আসন লাভ করেছিল। সেই তাঁর প্রথম 'বাহিরে যাত্রা'। তখন সেই বালক সমাজ ও প্রকৃতির কাছে দায়শূন্য। কেবল নিজের আনন্দের জন্যই তার সব আয়োজন। কেউ দেখল বা দেখল না, শুনল বা এড়িয়ে গেল বুঝল কিংবা অবজ্ঞা করল তাতে কী বা আসে যায়। তারপর যৌবনে সচেতন হল মন। তখনকার সব আয়োজনের মধ্যে এসে গেল দায়বদ্ধতা। তোমাদের শোনানোর তাগিদ তাড়িত করল নিজের আনন্দের অংশকে। আর আজ যখন কর্মী রবীন্দ্রনাথ নিজের আপন প্রাণশক্তিতে মূর্তিপরিগ্রহ করল তখন তার পরিচয় গোপন রইল না। তখন নিঃসংশয় দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তাকে। তখন সকলকে ডেকে বললেন 'তোমরা এসো'। কবির কর্ম আজ পরিণতিতে বিশ্বের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। আর তাই আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত কর্মী কবির 'তোমাদের দেখানোর' তাগিদ অতিক্রম করে গেল তাঁর আনন্দের অংশকে। চন্দননগরে আয়োজিত রবীন্দ্র-সম্মান অনুষ্ঠানের উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিবেদন— ' সেই বিশ্বের ধর্ম যখন কর্মের মধ্যে দেখা যায় তখন, শুধু সম্মান নয়, সহায়তা দাবি করবার অধিকার জন্মে। সেই অধিকার আজ এই সভায় সকলের কাছে নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করি।'(১৫)

রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়সে পৌছেও একদিনের জন্যেও বিস্মৃত হন নি তাঁর জীবনের উপলব্ধির মুহূর্তগুলিকে। তাই যখনই তিনি আত্মজীবনী রচনার কথা ভেবেছেন তখনই আশৈশব স্মৃতি বিজড়িত মানুষগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। বাহ্য ঘটনাবলী পেয়েছে সামান্য গুরুত্ব।

জীবনস্মৃতিতে রয়েছে তাঁর কৈশোর থেকে আরম্ভ করে যৌবনের স্মৃতি। 'ছিন্নপত্র'-এর পত্রাবলী যদিও চিঠি কিন্তু আসলে এগুলি তাঁর শান্তিনিকেতনে আসার পূর্বপর্যন্ত বাংলার পল্লী প্রকৃতির মাঝখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্রীক জীবন। তারও পরবর্তী জীবন ব্যক্ত হয়েছে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বিভিন্ন অভিভাষণ, বিদেশ ভ্রমণের উপর লেখা চিঠিপত্র আর আত্মপরিচয়মূলক কিছু কিছু প্রবন্ধে। কিন্তু একেবারে শিশু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিমধুর দিনগুলি ও তাঁকে ঘিরে থাকা অজস্র ব্যক্তিচরিত্রগুলির কথা রয়েছে ছেলেবেলা গ্রন্থটিতে। অবশ্য জীবনস্মৃতির অনেক ঘটনার উল্লেখ এতে রয়েছে। লক্ষণীয় এটি রবীন্দ্রনাথের সব থেকে পরিণত বয়সে লেখা। এটির ভাষা 'বালভাষিত গদ্য' এবং স্মৃতিকে ছেলেবেলার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি রচনা করে যে তৃপ্ত হতে পারনে নি সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঠকের যখন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি— 'গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্য কিছু লেখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক।'(১৬) তাহলে জীবনস্মৃতিতে ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা হয় নি?

না ছেলেদের জন্যে লেখা হয় নি? বোধহয় দুটোই । কারণ ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ তার শৈশবের অনুভূতি দিয়ে যে পারিপার্শ্বিকটাকে দেখেছিল তাতে বুদ্ধির থেকে বোধের ভাগটাই ছিল বেশি। তাই সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সম্ভব-অসম্ভবের পরস্পর জড়ানো সীমাসরহদ্দের রথ বেয়েই ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে শহর কলকাতার শিশুদের মনে যে ভূতপ্রেত শাঁকচুন্নী বাসা বেঁধেছিল তার এমন সহজ ও অনায়াস বর্ণনা জীবনস্মৃতির লেখকের রচনায় মূল্য পায় নি।

আবার যদি বলি ছেলেদের জন্যেও তা লেখা হয় নি তাহলে পড়া যাক ছেলেবেলার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি — ' সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষী কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে।'(১৭) তাহলে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের যে অন্তরঙ্গতা সেটাও বেশ ছেলেদের উপযুক্ত হল এবার। শ্রীকণ্ঠবাবু বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষক এবং অনবদ্য শ্রোতা ছিলেন। জীবনস্মৃতির একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় এই ব্যক্তিটির বর্ণনায় লিখেছেন। অথচ ছেলেবেলা গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের মাত্র কয়েকটি লাইনে শ্রীকণ্ঠবাবুর উল্লেখ ও পরিচয় করিয়েছেন। ' আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুণগুণ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন নেচে নেচে বাজাতেন সেতার, হাসিতে বড়োবড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন 'ময় ছোড়োঁ ব্রজ কী বাঁসরী'। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।'(১৮) এর থেকে বেশি কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানার আছে বা জীবনস্মৃতিতে তিনি জানিয়েছেন তা মনে হয় না। এরকম একাধিক উদাহরণ খুঁজলে মিলবে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে কিশোর চরিত্র একটি বিশেষ মাত্রা নিয়ে উপস্থিত থাকে। বিসর্জনের 'হাসি' যখন বলে 'এত রক্ত কেন?' তখন রবীন্দ্রনাথ সেই কিশোরের মাধ্যমে পাঠককে জানাতে চান পৃথিবীতে এত হিংসা কেন? কিংবা 'রক্তকরবী'তে কিশোর নন্দিনীকে রোজ রক্তকর্রবী ফুল এনে দিত মালিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে— ভালবাসার বিনিময়ে এই নির্ভিক নিঃস্বার্থপরতা তার একমাত্র সম্পদ বলে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এই কৈশোরকেই ফিরে দেখতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক ছেলেবেলা গ্রন্থে। তাঁর ভাষায় ' ছেলেমানুষের বুদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য।'(১৯)

যদিও রচনার শুরুতে গ্রন্থকার পাঠককে জানিয়েছেন— 'এই বিবরণটিকে ছেলেবেলার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক সেই সীমা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি।

১। 'গঙ্গাধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে ছোটো সে দোতলা বাড়ি। ··· তখন আমার বয়স ষোলো কি সতেরো। '(২০)

২। 'ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে। এবার ষোলো বছর বয়সের কথা বলব।'(২১)

৩। 'সতেরো বছরে পড়লুম, যখন, ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হলো। '(২২)

৪। 'উঠলুম বিলেতে গিয়ে, · · · আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেয়েছিলুম মাত্র তিন মাস।'(২৩)

এছাড়াও কিছু ঘটনার কথা তিনি বলেছেন যেগুলি তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি নয়। আসলে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এড়ানো তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি তাঁর শেষ বয়সের অন্যান্য রচনাতেও এই ধরণের ত্রুটি লক্ষিত হয়।

ছেলেবেলার লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সেকাল ও একালের মধ্যে হালকাভাবে একটা তুলনা করেছেন। তাঁর শৈশব কৈশোরের দিনগুলির সঙ্গে একাল অর্থাৎ তাঁর আশি বছরের দিনগুলির বিস্তর তফাৎ। সে তফাৎ শুধু সময়ের বদলের জন্য নয় সেই বালকটির বয়স, মন ও মর্জি বদলের জন্যেও বটে। বিজলি বাতি ভূতের ভয় শহর কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু ভূতের গল্প আজও শিশু কিশোরদের মন জুড়ে রয়েছে।

সেকালের ঠাকুরবাড়ি ও শহর কলকাতার নানা বিশিষ্টতা রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন আবার তারই মধ্যে রয়েছে তাঁর পরিণত মননের পরিচিতি। 'বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা অনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়া গেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়।' রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন—

'এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্‌কি পরাতে।
আবার উল্‌কি পরা যেমন-তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুরঝি
উল্‌কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি।
ঠাকুরঝি।'(২৪)

কিন্তু এই যে বিষ্ণু ও তার গান ছেলেদের অতি পরিচিত, নাইবা থাকল তাতে ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিশিষ্টতা, দেশজ সুবাসেই তার শ্রেষ্টত্ব । কিংবা শখের যাত্রার যে ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার মূল্য পরিচালনার গুণে নয় কিশোর মনের প্রথম অভিনয় দেখার উচ্ছ্বাস ও অভিজ্ঞতার সূত্রেই তার শাশ্বত মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ শহর কলকাতার অজস্র টুকরো ছবি এঁকেছেন। কখনও সন্ধ্যা নামছে, কখনও বৈশাখের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে, কলকাতার লোকের অকপট আতিথেয়তা। আবার রান্নাঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে চাতালের রোদে শুকোতে দেওয়া আচার ও বড়ির কথা। 'বাড়ির ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল

তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলাভরা কলাইবাঁটা নিয়ে। টিপে টিপে টপটপ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে । তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকনো হত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা কাজ করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত। রোদ খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে।'(২৫) এই রকম আরও অজস্র ছবি তার খুঁটিনাটি নিয়ে বালকের দৃষ্টিতে যেমনভাবে ধরা পড়ত ঠিক তেমনিভাবেই ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে। আর আজ যারা তিনশো বছর পরবর্তী কলকাতাকে দেখছে তাদের কাছে ঐ বালক এক অ-পূর্ব বিস্ময় মাখানো কলকাতাকে এনে হাজির করেছে। সে কলকাতার ছবিতে সমাজ রাজনীতি বা ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ নেই, কিংবা এ সবের ভালোমন্দের হিসাব নিকাশের বর্ণনা নেই, শুধু রয়েছে সূর্যের আলোর সাতরঙে রাঙানো কিশোর মনের মাধুরী দিয়ে গড়া তার দেখা কলকাতার চলচ্ছবি।

আর রয়েছে বালক রবীন্দ্রনাথের দেখা মানুষগুলি। সে মানুষের সারিতে প্যারী দাসী, ব্রজেশ্বর, শ্যাম রয়েছে। আবার বিষ্ণু, শ্রীকণ্ঠ বাবু, কানা পালোয়ান, অঘোরবাবু, নীলকমল মাষ্টারও রয়েছে। আরও রয়েছে রবির নতুন বৌঠান। জ্যোতিদাদা, মেজবৌঠান, মা, পিতৃদেব, বড়দাদা এমন আরও অনেক অনেক ছোটো বড়ো চরিত্র। তাদের প্রত্যেকেরই এই কিশোরটির জীবনের সঙ্গে রয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধন । রবীন্দ্রনাথ ব্রজেশ্বরের বর্ণনা দিচ্ছেন— 'আমাদের এই মাদুর পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়াগলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষীকান্ত, নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাছে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করছে।··· যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই । স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাসা জলে হাত দিয়ে পাঁচসাত বার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গিতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনো মতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই জাত বাঁচে।'(২৬) ব্রজেশ্বরের মতো চরিত্র সে যুগে দুর্লভ নয় কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্রজেশ্বরদেরও সহজেই উপেক্ষা করে চলে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তখন সেই সামান্য ব্রজেশ্বরকে তার চরিত্রের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক অসামান্য মহিমায় উন্নীত করে দেন, বিস্মিত পাঠক মন বলে ওঠে এমন করে তো তাকে আগে দেখিনি।

আবার নীলকমল মাস্টার কিংবা অঘোরবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গৃহ শিক্ষক। কিন্তু এই গৃহশিক্ষকেরা বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে স্মৃতি জুড়ে রয়েছে তা অত্যন্ত বেদনার। অন্তত সেই সময়ের পরিপেক্ষিতে তো বটেই, আজ তা যতই কৌতুকাবহ হয়ে উঠুক না কেন। 'দেউড়িতে বাজল সাতটা । নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাৎ হবার জো ছিল না। খটখটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, একদিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে শ্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে

অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত— সবই বাংলায় পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখগণিত।'(২৭)

'পড়বার ঘরে জ্বলে উঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলের ওপর। মলাটটা ঢলঢলে , পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগী, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে— সবই ক্যাপিটাল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।'(২৮)

এই রকম আরও অনেক ছোটো বড়ো চরিত্র পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নানা নামে ঘুরে ঘুরে এসেছে। এদের দোষত্রুটি ভালমন্দ সবরকম বৈশিষ্ট্য নিয়েই এরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—' যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল সেটাকে বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই । তার মাল মসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরে লোকের হাতে।'(২৯) এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা সজীব হয়ে উঠেছে ঘরের লোকের বিচিত্র স্মৃতির বুননে।

উৎস-নির্দেশিকা

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে লেখা পত্রের অংশ।

২। আত্মপরিচয়/ প্রবন্ধ সংখ্যা ১। রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৮৯, পৃ: ১২৯।

৩। ছিন্নপত্র/সংযোজন। পুর্নমুদ্রণ ভাদ্র ১৩৮২। বিশ্বভারতী । পৃ: ২৮৮।

৪। ঐ, পৃ: ২৮৮-২৮৯।

৫। ঐ, পৃ: ২৮৯-২৯০।

৬। ভূমিকা/জীবনস্মৃতি । রবীন্দ্ররচনাবলী -একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৮৯ পৃ:৪।

৭। কড়ি ও কোমল/জীবনস্মৃতি ঐ , পৃ: ৯১।

৮। আত্মপরিচয় /প্রবন্ধ সংখ্যা-১ , ঐ, পৃ: ১২৭।

৯। ঐ, ঐ, পৃ: ১৩৫।

১০। আত্মপরিচয় / প্রবন্ধ সংখ্যা-৪, ঐ, পৃ: ১৫৫।

১১। আত্মপরিচয় / প্রবন্ধ সংখ্যা-৫, ঐ, পৃ: ১৫৭।

১২। আত্মপরিচয়/ প্রবন্ধ সংখ্যা-৪, ঐ, পৃ: ১৫৬।

১৩। ঐ, ঐ, পৃ: ১৫৫।

১৪। আত্মপরিচয় / প্রবন্ধ সংখ্যা-৫, ঐ, পৃ: ১৫৮।

১৫। সম্মান/ আত্মপরিচয় সংযোজন, ঐ, পৃ: ১৬৬।

১৬। ভূমিকা /ছেলেবেলা, ঐ, পৃ: ৯৬।

১৭। ঐ, ঐ, পৃ: ৯৬।

১৮। ছেলেবেলা ৭নং পরিচ্ছেদ, রবীন্দ্ররচনাবলী-একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ১৯৮৯। পৃ: ১০৬।

১৯। ভূমিকা/ ছেলেবেলা। ঐ, পৃ: ৯৬।

২০। ছেলেবেলা / ১৩ নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ: ১১৬।

২১। ঐ, ঐ, পৃ: ১১৬।

২২। ঐ, ঐ, পৃ: ১১৭।

২৩। ছেলেবেলা/ ১৪ নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ: ১১৯।

২৪। ছেলেবেলা/ ৭নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ: ১০৫।

২৫। ছেলেবেলা / ৮নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ: ১০৮।

২৬। ছেলেবেলা / ৩ নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ: ১০০।

২৭। ছেলেবেলা / ৭ং নং পরিচ্ছেদ , ঐ, পৃ: ১০৭।

২৮। ঐ, ঐ, পৃ: ১০৮।

২৯। ছেলেবেলা / ১৪নং পরিচ্ছেদ, ঐ, পৃ:১১৮।